তটমন্দিরের ইতিকথা

মুছে গিয়েছে সাম্রাজ্যের পুরোনো রাজ্যপাট। তবু থেকে গিয়েছে ঐতিহ্যের পাথুরে স্বাক্ষর, অনেক প্রাচীন মন্দির, ভাঙা ভাঙা ঘর আর সেই সময়ের কিছু ধ্বংসাবশেষ। মহাবলীপুরম ঘুরে এলেন অভিষেক চট্টোপাধ্যায়

নাছোড় মেঘের কান্না আর শেষ হয় না। সুয্যিমামা কষ্ট করে হাসির চেষ্টা করেও ঠিক পেরে উঠছে না। দক্ষিণ ভারতে বন্যা পরিস্থিতি তখন অনেকটাই আয়ত্তে। তবুও যখন তখন বদরোগের মতো ফিরে আসতে পারে। বলতে বলতেই একেবারে জোলো ধোঁয়াশার লোটাকম্বল নিয়ে নামল। রাস্তার পাশে উড়তে থাকা কচি সবুজের আঁচল ভিজে চুপচুপ করছে। পুদুচেরি থেকে চেন্নাই যাওয়ার পথে মামল্লাপুরম বা মহাবলীপুরম দেখে যাব। এটা নিয়েই গতকাল রাত থেকে ছোট মেসোর সঙ্গে রীতিমতো দক্ষযজ্ঞ। যদিও বা তিনি রাজি হলেন, প্রকৃতি বেঁকে বসল। তবে কী সব মাটি? কিন্তু নাহ্! আমাদের গাড়ির সঙ্গে বৃষ্টিটাও থামল। পা রাখলাম সমুদ্র আর মন্দির সমৃদ্ধ তামিলনাড়ুর প্রাচীন শহর মহাবলীপুরমে। আগে এরই নাম ছিল মামল্লাপুরম।

আশেপাশে অনেক দোকান। সমুদ্রের ধারে যাওয়ার আগে পথ মিলিয়ে দিল শোর টেম্পলে। টিকিট কেটে ফটক পেরিয়ে যেন সবুজের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। দূরে গা-ভর্তি স্থাপত্যের অলংকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীনতম মন্দির। আর তাকে ঘিরে লোহার তারজালি দিয়ে ঘেরা বিস্তীর্ণ প্রান্তর। শ্যামলের লাবণ্য মন্দিরের গ্রানাইট পাথরের উজ্জ্বলতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তার উপর অকাল শ্রাবণের জলে সদ্যস্নাত মন্দির। সেই ৭০০-৭২৮ খ্রিস্টাব্দে তৈরি। তখন মামল্লাপুরম ছিল পল্লব সাম্রাজ্য শাসিত একটি ব্যস্ত বন্দর। একটি বড় ও দু'টি ছোট ছোট মন্দির নিয়ে এই শোর টেম্পল। ২০০৪ সালের সুনামি এখানকার শৈল্পিক সম্পদের অনেকটাই কেড়ে নিয়ে গিয়েছে। তবুও কালের রাখাল হয়ে কিছু স্থাপত্য আজও পাহারা দিচ্ছে অনাদি অতীতকে।

মন্দিরের সামনে লাল বাঁধানো চত্বর। প্রতিটা মন্দিরের চূড়া বহুবিধ কারুকাজে মোড়া রথের চূড়ার মতো। যত কাছে এগিয়েছি অদ্ভুত এক অনুভূতি ঘিরে ধরেছে আমায়। মাথার উপর আদিগন্ত আকাশ। ঘন কালো মেঘ ঘনিয়ে আছে। মনে হচ্ছে মহাজাগতিক কিছু একটা ঘটবে। হ্যাঁ ঠিকই তো, মহাজাগতিকই বটে। মন্দিরের পাথরগুলোকে যত ছুঁয়ে দেখছি ততই স্পর্শ পাচ্ছি তাঁদের, আজ থেকে শত শত বছর আগে যাঁদের হাতের ছোঁয়া পেত গর্ভগৃহে বসে থাকা কালো পাথরের বিগ্রহ, যাঁরা রাজশাহি নাগরা মসমসিয়ে হেঁটে যেতেন, এই মুহূর্তে আমার চলা পথের উপর দিয়ে। রাজা-রানি-রাজপুত্তুর হারিয়ে গিয়েছে। মুছে গিয়েছে সাম্রাজ্যের পুরোনো রাজ্যপাট। থেকে গিয়েছে ঐতিহ্যের পাথুরে স্বাক্ষর, এইসব প্রাচীন মন্দির, ভাঙা ভাঙা ঘর আর কিছু ধ্বংসাবশেষ। পিছনের একটি মন্দিরের ভিতরে সোঁদা অন্ধকার গায়ে জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছেন পাথরের বিষ্ণু। তাঁর যোগনিদ্রা এখনও ভাঙেনি। মন্দিরের কোনও খিলানের গা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে সিংহ। কিন্তু হায়! সময়ের চাকা তার শরীরী অবয়বের ক্ষিপ্রতাকে অনেকটাই মলিন করে দিয়েছে। একটানা সমুদ্রের গর্জন কানে আসছে। সমুদ্রের ঢেউগুলো ইতিহাসের গায়ে যেন মহাকালের যাওয়া আসা, 'শুধু স্রোতে ভাসা'। সমুদ্রের কাছে যেতে হলে একই পথে বেরিয়ে আসতে হবে দেবালয়-প্রাঙ্গণ থেকে। বাইরে সারি সারি দোকান। ছোট্ট থেকে বিশালাকৃতির পাথরের মূর্তিগুলো দোকানের বাইরে সাজানো। নানা দেবদেবীরা হাজির সেই পাথুরে সংসারে। স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে মাছ ভাজার গন্ধ সেবন করছেন। কারণ এর পাশেই সামুদ্রিক মাছগুলোর গায়ে মশলা মাখিয়ে সাজানো। চোখ পড়লেই জিভে জল। কাঁকড়াগুলোকেও একই সাজে সাজিয়ে চলতি পথিকের রসনাকে উস্কে দিচ্ছে দোকানিরা। এমনই কপাল, আজই আমি সকাল থেকে গ্যাসট্রিকের ব্যথায় কাবু। তাই ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনং। তখনও দোকানের চৌহদ্দি পার করিনি। ঝমঝম করে নামল দক্ষিণী বর্ষা। দোকানের তলায় আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। দূরে সামুদ্রিক হাঁকডাকের উপর উত্তাল বৃষ্টির শব্দ মিশে এক অনবদ্য লহরী সৃষ্টি করেছে। আসলে দক্ষিণ ভারতের সবখানেই সুর-তাল-ছন্দের ঝংকার। তাই প্রকৃতিতেও তার সুললিত প্রতিফলন।

খানিকবাদেই বৃষ্টি থামল। রোদ্দুর উঠল না। তবে আকাশে-মাটিতে যে মায়াবি আলো সংসার বিছালো তাতে শরতের আগমনী সুস্পষ্ট। আকাশ থেকে ঘন কালো মেঘের দল দৌড়ে পালিয়েছে। ফ্যাটফ্যাটে সাদা মেঘগুলোর বুক চিরে দেখা দিয়েছে নীল হাসি। পায়ের নীচে কিচকিচ করে উঠল বালি। বালিয়াড়ির বুকেও রংয়ের বাহার। কেউ তরমুজ আর আনারস কেটে সাজিয়েছে। কেউ ভুট্টা সেঁকে নুন-লেবু মাখিয়ে রাখছে। কেউ আবার সাত রঙা বেলুন সাজিয়ে বন্দুক তাক করছে। সাগরপাড়ে আনন্দমেলা। সমুদ্রের জল কিছুটা বেপথু হয়ে বালির বুকে ঝুলনের নদী বানিয়েছে। সেখান দিয়ে তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে ফল্গু। একটা-দু'টো ঘোড়া সেই খেলনা নদীর বুকে মুখ ডুবিয়ে জল খেয়েই চলেছে। দূরের মন্দিরটা অপলকে চেয়ে দেখছে। সমুদ্রের আরও অনেক কাছে পৌঁছে গিয়েছে এক দম্পতি। লাল পেড়ে সাদা শাড়িটা হাঁটুর কাছে তুলে উত্তাল ঊর্মিমালায় পা ডুবিয়েছে দক্ষিণী রমণী। পিঠে এলিয়ে পড়া বেণীবাঁধনে জাপটে থাকা সাদা ফুলের মালা সাগর থেকে ছুটে আসা বেমক্কা হাওয়ায় দুলে দুলে উঠছে। আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মতোই মাটির বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পর্যটকের দল। ঘোড়ার পিঠে চেপে ছোট্ট ছেলেটা সমুদ্রের হাওয়ায় ভাসছে। আকাশের ঘোলাটে জলরং জলধির সঙ্গে মিশে আরও ঘন হচ্ছে। দিগন্তের সীমারেখা ছুঁয়ে সফেন ফেনিল তরঙ্গ হয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে বালিয়াড়ির বুক। জমাট পাথর মুখ ডুবিয়ে চুপ। আকাশের রং পালটাচ্ছে। তাই সমুদ্রের ধার থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে মেটে ইতিহাস আর শ্যামলিমার কোলে এসে থামা। কথিত আছে, বনবাসকালে পাণ্ডবরা এখানে এসেছিল। পঞ্চপাণ্ডবের নামে রথও আছে। কিছু গিয়েছে সুনামির অতলে। এখনও যা আছে, তাতে পাথরের উপর নিখুঁত দুর্দান্ত ভাস্কর্য চোখে টেনে রাখে। বৌদ্ধ কারুকাজের ছাপ স্পষ্ট। এই যে খিলানসমৃদ্ধ দালান দেওয়া মন্দির, গুহা- তা প্রথমদিকের দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির স্মারক। সবুজ মোরামের উপর দিয়ে হেঁটে উপরে যেতেই দেখি একটি পাথর মাত্র একটি বিন্দুর উপর ভরে করে টিকে আছে। ব্যালেন্সিং রক। পাশেই প্রাচীন গুহার বিরাট হাঁ মুখ। গুহার ভিতর ঢুকতেই নাকে একটা গন্ধ এল। বৃষ্টিভেজা সোঁদা মাটির গন্ধ নয়, পাথরের গায়ে জমা শ্যাওলারও গন্ধ এরকম হয় না। তবে কীসের? ঘন জঙ্গল আর কঠিন পাথরের ঘেরাটোপে এই গুহার অন্ধকারে কী আজও তারা লুকিয়ে আছে, অধর্মনাশী কোনও কুরুক্ষেত্রের জন্য? গর্জে উঠল মেঘ, ঝাঁপিয়ে নামল বৃষ্টি। বৃষ্টি! নাকি, শূন্য থেকে শত-সহস্র তির এসে ঝাপসা করে দিল বাইরের পৃথিবীটাকে!

জেনে নিন ঃ ট্রেন বা বিমানপথে চেন্নাই পৌঁছে সেখান থেকে বাস বা গাড়িতে মামল্লাপুরম বা মহাবলীপুরম পৌঁছোনো যায়। চেন্নাই বা পুদুচেরিতে রাত কাটানোই ভালো।

plan করুন

শেখাবতী উৎসব

জয়পুর থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে রাজস্থানের শেখাবতী অঞ্চলে গত ২৩ বছর ধরে চলে আসছে শেখাবতী উৎসব। শেখাবতী অঞ্চল বলতে বোঝায় শিকার, নলগড়, চুরু আর ঝুনঝুনু শহর। যেহেতু জয়পুর থেকে নলগড় সহজে যাতায়াত করা যায় তাই নলগড়েই মূল উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। শেখাবতী উৎসবে অনেক রকম বিনোদনের ব্যবস্থা আছে। আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গ্রামীণ খেলাধূলা, বাজির প্রতিযোগিতার মতো অনুষ্ঠান। মূল কথাটা হল, রাজস্থানের যাবতীয় ঐতিহ্য এবং পরম্পরা প্রদর্শনের জায়গা শেখাবতী উৎসব। এই উৎসবের আয়োজক হল রাজস্থান পর্যটন দফতর, শিকার-ঝুনঝুনু-চুরু জেলা প্রশাসন, শেখাবতী রুরাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন। পর্যটন শিল্পকে জনপ্রিয় করতেই এই উৎসবের আয়োজন। উৎসবের মুখ্য আকর্ষণ রাজস্থানের রাজাদের হাভেলি বা রাজপ্রাসাদে রক্ষিত বিখ্যাত ব্যক্তিদের আঁকা অসাধারণ সব ছবি, ম্যুরাল, ফ্রেসকো শেখাবতী উৎসবে প্রদর্শিত হয়। এই উৎসব অন্য উৎসব থেকে একটু আলাদা রকমের। সেটা হল, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দর্শকদের এবং উৎসবে অংশ নেওয়া প্রতিযোগীদের চার দিনের এই মেলার কোনও এক সময়ে জৈব খাদ্য বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। প্রতিবছর ১৫-১৮ ফেব্রুয়ারি শেখাবতী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।